ভাষা আন্দোলনে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভূমিকা

এম আবদুল আলীম

DOI: https://doi.org/10.69862/carass2025LMBookAleem

প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কারা?

সাধারণত কেন্দ্রীয় নয়, সমাজের প্রান্তস্থিত সাধারণ জনগোষ্ঠীকেই প্রান্তিক[১] জনগোষ্ঠী বলা হয়। তাত্ত্বিক কাঠামোয় অনেকে এদের 'নিম্নবর্গ'[২] বলে অভিহিত করে থাকেন। তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা না করে সাধারণভাবে যাদের আমজনতা বলা হয়, সেই কিষান-কিষানি, শ্রমিক, দিনমজুর, তাঁতি, কামার, কুমার, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, ক্ষুদে ব্যবসায়ী, দোকান কর্মচারী তথা সাধারণ মানুষদের ভাষা আন্দোলনে অবদানের স্বরূপ অন্বেষণেই এ প্রবন্ধের অবতারণা। ভাষা আন্দোলনের শুরুতে তেমন সম্পৃক্ততা না থাকলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে তাদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ আকস্মিক ব্যাপার ছিল না– এর মূলে ছিল দীর্ঘ শোষণ-বঞ্চনাজাত ক্ষোভ ও যন্ত্রণার অভিপ্রকাশ। তাছাড়া ভাষা আন্দোলন তো নিছক একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল না; এর সঙ্গে পূর্ববঙ্গের জনগণের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল (উমর, ২০১৭, ৩ পৃ. ৩৯৩)। আন্দোলন যতদিন রমনা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল, ততদিন তা প্রবল রূপ ধারণ করেনি। বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারির পর রমনা পার হয়ে পুরান ঢাকা এবং পুরান ঢাকা থেকে সমস্ত পূর্ববঙ্গের আনাচে-কানাচে পৌঁছে যায় এ আন্দোলন। এতে ছাত্রদের সঙ্গে যুক্ত হয় বিক্ষুব্ধ কৃষক-শ্রমিক তথা সাধারণ মানুষ। আর তখনই ভাষা আন্দোলন হয়ে ওঠে দুর্দমনীয় (চৌধুরী, ২০০৮, পৃ. ২২০-২২১)। এ বিষয়ে অনুসন্ধান, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করতে গেলে সঙ্গত কারণেই কয়েকটি প্রশ্ন সামনে আসে: প্রথমত, কোন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতায় সাধারণ মানুষ ভাষা আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল? দ্বিতীয়ত, কারা তাদের সংগঠিত করেছিল? তৃতীয়ত, শাসকদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে কীভাবে তারা দলে দলে এ আন্দোলনে শামিল হয়েছিল? চতুর্থত, শেষ পর্যন্ত তাদের অর্জনটাই-বা কী ছিল? এসব প্রশ্ন সামনে রেখে নির্দিষ্ট গবেষণা-পদ্ধতির আলোকে এ প্রবন্ধে ভাষা আন্দোলনে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভূমিকার স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে।

ভাষা আন্দোলনে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের আর্থ-সামাজিক পটভূমি

বাঙালি চিরকালের বিদ্রোহী জাতি (চক্রবর্ত্তী, ২০১১, পৃ. ৫৫)। বাংলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তথা সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, সংগ্রাম এবং বিদ্রোহের ইতিহাস দীর্ঘকালের; এবং সে ইতিহাস অতীব গৌরবদীপ্ত। অত্যাচারী জমিদার, নীলকর, মহাজন এবং জুলুমবাজ শাসক-শোষকের বিরুদ্ধে তারা কালে কালে প্রতিবাদ করেছে এবং সশস্ত্র বিদ্রোহের ডাক দিয়েছে। কৈবর্ত-বিদ্রোহ, কৃষক-বিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহ, নৌবিদ্রোহ, নানকার-বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন– এসবের প্রতিটির সঙ্গেই সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও শৌর্য-বীর্য জড়িয়ে রয়েছে।[৩] এসবের পেছনে কাজ করেছে আর্থ-সমাজিক-রাজনৈতিক শোষণ-বঞ্চনাজাত নানা ক্ষোভ ও যন্ত্রণা। ভাষা আন্দোলনের সময়কার দেশ-কাল-সমাজের

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সাধারণ মানুষ তখন নানাভাবে বঞ্চিত ছিল। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের সংকটের পাশাপাশি ছিল বহুমাত্রিক শোষণ-নিপীড়ন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের জাঁতাকল থেকে মুক্তি পেতে না পেতেই নতুন মাত্রায় শুরু হয় পাকিস্তানি দুঃশাসন; যা তাদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে। এমন বাস্তবতায় ভাষা-সংস্কৃতির আগ্রাসনে জীবন-মান, স্বকীয় সত্তা সবকিছু পঙ্গু করার দুরভিসন্ধি তারা মেনে নিতে পারেনি। মূলত, অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার তাগিদেই তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভাষা আন্দোলনে যুক্ত হয়। এ প্রসঙ্গে হাসান হাফিজুর রহমান লিখেছেন:

> মেকি আজাদীর রঙিন ছটা আর উজ্জ্বল নতুন দিনের সোনালী স্বপ্ন কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে– জাতির জীবনে, সমগ্র দেশের বুকে নেমে এসেছে নীরন্ধ্র অন্ধকারের কালো বিভীষিকা। সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের দোসর প্রতিক্রিয়ার দানবীয় নিষ্পেষণে দেশের অর্থনৈতিক জীবন পঙ্গু, শিক্ষার অধিকার, ভাষা ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা বিপর্যস্ত, গণতন্ত্র নির্বাসিত। আর এই নিঃসীম অন্ধকারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জনতার জীবন গভীর হতাশায় আচ্ছন্ন। এমনি দুর্দিনে এক ঝলক আশীর্বাদের আলোর মতোই এলো একুশে ফেব্রুয়ারী। দিনে দিনে যে বিপুল বিক্ষোভ পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে জমেছিল মানুষের মনে মনে, শহীদের পবিত্র রক্তের স্পর্শে যেন কোন মন্ত্রগুণে তার বাঁধ গেল ভেঙে – উচ্ছল জোয়ারের কলধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশ জুড়ে (রহমান, ২০১৬, পৃ. ১১)।

বাস্তবেই মেকি আজাদীর রঙিন ছটা অল্প দিনের মধ্যেই ফিকে হয়ে যায়। যে স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা বুকে ধারণ করে এ অঞ্চলের মানুষ স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে সেগুলোর কোনোটিই পূরণ হয়নি। বিপরীতে আর্থিক শোষণ, সামাজিক নিপীড়ন, বাক্‌স্বাধীনতা হরণ, জেল-জুলুম-নির্যাতন, ক্ষুধা-দারিদ্র্য প্রভৃতি তাদের নিত্যসঙ্গী হয়; যার অভিঘাত কেন্দ্র থেকে প্রান্ত সর্বত্র বিস্তৃত হয়। এক কথায়, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক আচরণ ও আগ্রাসি নীতির কারণেই সাধারণ মানুষের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ।

শুরুতেই পাকিস্তান রাষ্ট্রটির দায়িত্বভার কব্জা করেন অবাঙালি পুঁজিপতি, অভিজাত সামন্ত-ভূস্বামী, সাম্রাজ্যবাদের তল্পীবাহক রাজনীতিবিদ ও আমলারা। নিজেদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তারা শিল্প-কারখানা, ব্যবসায় কেন্দ্র, ব্যাংক-বিমা প্রতিষ্ঠান, শাসনকার্য পরিচালনার দপ্তরসমূহ সবকিছু স্থাপন করে পশ্চিম পাকিস্তানে। ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান, জুট বোর্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে একচেটিয়াভাবে চাকরি দেওয়া হয় করাচি-লাহোরের লোকদের, তাতে বাঙালিরা হয় উপেক্ষিত। অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও পশ্চিম পাকিস্তানিরা প্রাধান্য লাভ করে। সর্বোপরি চাকুরির পরীক্ষা থেকে বাদ দেওয়া হয় বাংলা ভাষা। এর ফলে পূর্ববঙ্গের যুবকেরা বেকারত্বের অভিশাপে পর্যুদস্ত হয়। কৃষক পাট ও অন্যান্য ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় না। বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রেও করা হয় বিমাতাসুলভ আচরণ।[৪] চাকরি, শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য সবকিছুতেই সীমাহীন বৈষম্য এ অঞ্চলের মানুষকে হতাশ করে। এভাবে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর একচোখা নীতির কারণে প্রতিটি ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে পূর্ববঙ্গ। অঞ্চলটি যেন পরিণত হয় তাদের কলোনিতে। সাধারণ মানুষ হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে ক্রমে কঙ্কালসার হয়ে গেলেও তাদের ভাগ্য-পরিবর্তনের আশা সুদূর পরাহত হতে থাকে। ঐ সময়ের চিত্র তুলে ধরে সরলানন্দ সেন লিখেছেন:

> ব্রিটিশের উপনিবেশের বদলে আজ করাচীর উপনিবেশে পরিণত হচ্ছে এই দেশ। আমাদের চাষী মজুর হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খেটে রোদে পুড়ে, বর্ষায় ভিজে, শীতে কেঁপে সাঁতার পানি বিলে ডুব দিয়ে পাট কাটে, ফসল তোলে, সোনার ধানে গোলা ভরে, স্বর্ণসূত্রে দিগন্ত ঝলসে দেয়। কিন্তু, তাদের

> দুর্দৈব ঘুচে কৈ? পরণে সেই তিন হাত গামছা, মাটির শানকীতে নুন আর পান্তা, পান্তা আর নুন, ছালন বলতে শুক্‌নো লঙ্কা পোড়া! এই দারিদ্র্য পীড়ত দুঃখ-দগ্ধ জীবনের ভার আমাদের বাপ-চাচারা আর বইতে পারছেন না। রোগ শোক দুর্ভিক্ষ ও প্লাবনের নিয়মিত কশাঘাত আমাদের মনুষ্যত্ব বোধ লোপ করে দিচ্ছে (সেন, ১৯৭১, পৃ. ৬)।

বন্যা, খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে সরকারি অব্যবস্থাপনা, শোষণ এবং মুনাফালোভীদের দৌরাত্ম্যে পূর্ববঙ্গে খাদ্যসংকট প্রকট আকার ধারণ করে। খাদ্যের চাহিদা মেটাতে সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের লোকেরা সোনা-রুপার অলংকার, এমনকি কাঁসার থালা-বাসন পর্যন্ত বন্ধক রাখে। তিনবেলা ভাত জোটাতে না পেরে ভাতের মাড়, আটার জাউ এসব খেয়েছে। বহু মানুষ দিনের পর দিন একবেলা খেয়ে, সময় সময় না খেয়েও দিনাতিপাত করেছে। স্থানে স্থানে লঙ্গরখানা খোলা হয়েছে। খাদ্যের অভাবে অনেক মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। খাদ্যের অন্বেষণে গ্রাম ছেড়ে দলে দলে শহরেও পাড়ি জমিয়েছে অনেকে। সরকার কর্ডন প্রথা চালু করলে দাওয়ালরাও সংকটে পড়ে। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের যে দুরবস্থা সৃষ্টি হয়, সে-সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সংবাদ ও প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। *সাপ্তাহিক নও-বেলাল* প্রকাশ করে, 'দুর্ভিক্ষের কবলে জগন্নাথপুর'সহ বেশ কয়েকটি প্রতিবেদন।[৫] নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম মাত্রাতিরিক্তি বৃদ্ধি পায়। সাধারণ কৃষক, দিনমজুর, শ্রমিক সকলের জীবনই দারিদ্র্যের কশাঘাতে বিপর্যস্ত হয়। নানা স্থানে অর্থ-সংকট প্রকট আকার ধারণ করে। পাটের দরপতন ঘটে। প্রতিমণ বিক্রি হয় ৫ থেকে ৮ টাকায়। অন্যদিকে চাউলের মূল্য বেড়ে দাঁড়ায় মণপ্রতি ২৮-৩০ টাকায়। সুদূর পল্লি অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যায় (সেন, ১৯৭১, পৃ. ২০১০)। এ সংকটে সরকারি ও বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ একে অপরকে দোষারোপ করেন। পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে এ নিয়ে চলে তুমুল বাক্‌যুদ্ধ। রাজপথেও নানা কর্মসূচি পালিত হয়। ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পূর্ববঙ্গ সফরে আসেন। তখন ব্যাপক খাদ্যসংকট চলছিল। এর প্রতিবাদে এবং দুর্ভিক্ষ দূরীকরণের দাবিতে আরমানীটোলা ময়দানে পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ এক জনসভা আয়োজন করে। এতে বক্তব্য দেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ। শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বক্তৃতায় দুর্ভিক্ষের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, একজন অন্যজনকে খুন করলে তার ফাঁসি হয়– যে নূরুল আমীন শত শত লোক খুন করছে, তার কী হওয়া উচিত? তাকে এই মাঠের মধ্যে এনে গুলি করা উচিত (উমর, ২০১৭ : ১, পৃ. ১০৯)। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে আয়োজন করা হয় ভুখা মিছিল ও প্রতিবাদ-সভা। অর্থনৈতিক সংকটের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট। জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হলেও সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন অব্যাহত থাকে। আগে জমিদারের গোমস্তা, কর্মচারী ও লাঠিয়ালরা অত্যাচার করলেও তাদের জায়গায় আবির্ভূত হয় সার্কেল অফিসার, তহশিলদার, চৌকিদার। খাজনা আদায়সহ নানা কাজে তারা সাধারণ মানুষকে হয়রানি ও অত্যাচার করে (উমর, ২০১৭: ১, পৃ. ১৫৬)। সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের সর্বত্র কর্কট-রোগের মতো ছড়িয়ে পড়ে অবক্ষয়-নৈরাজ্য। হানাহানি, হিংসা-বিবাদ, আধিপত্য বিস্তার, দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি মানুষের জীবনে সীমাহীন সংকট সৃষ্টি করে। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার নিম্নমান, অন্নকষ্ট ও চিকিৎসার অভাব ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। কলেরা-মহামারীতে বহু গ্রাম মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়। ১৯৪৮ সালে পূর্ববঙ্গে কেবল কলেরাতেই মৃত্যুবরণ করে ২৯, ৭০০ মানুষ (সেন, ১৯৭১, পৃ. ২৩২)।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর এই সর্বব্যাপী শোষণ, অব্যবস্থাপনা ও শাসনকাজে ব্যর্থতায় সাধারণ মানুষের জীবনে যে দুর্ভোগ নেমে আসে, তা-ই তাঁদের ভাষা আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার নেপথ্যে কাজ করে। বস্তুত,

ভাষা আন্দোলন তৈরির পেছনে মূল শক্তি জুগিয়েছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ভাঁওতাবাজির শিকার পূর্ব-বাংলার কৃষক-শ্রমিকরাই (রহমান, ২০০০, পৃ. ১৪২)। তাছাড়া এ আন্দোলনের অগ্রভাগে থেকে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অধ্যয়নরত সেই ছাত্র-ছাত্রীদের সিংহভাগই ছিলেন পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ মানুষদের সন্তান। ১৯৫২ সালের ২১ ও ২২শে ফেব্রুয়ারি হতাহতের পর আন্দোলন বিস্ফোরণরূপ ধারণ করলে সরকার ব্যাপক গ্রেপ্তার-হয়রানি শুরু করে। তাতেও আন্দোলন দমন করতে না পেরে অনির্দিষ্টকালের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ সময় ছাত্ররা নিজ এলাকায় গিয়ে সাধারণ মানুষদের সংগঠিত করে ভাষা আন্দোলন বেগবান করেন।

ভাষা আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহের সংক্ষিপ্ত ভাষ্য

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করলেও এর সূত্রপাত ১৯৪৭ সালের দেশভাগের অব্যবহিত পরে। এর আগে হিন্দি, উর্দু, বাংলা ভাষা নিয়ে চলে বহুমাত্রিক তর্ক-বিতর্ক। বাংলা ভাষার দাবিও পিছিয়ে থাকে না। ১৯৩৭ সালে মওলানা আকরম খাঁ বলেছিলেন, 'বাঙ্গালা সব দিক দিয়াই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী করিতে পারে'।[৬] ১৯৪৪ সালে আবুল হাশিম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কাউন্সিলে মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের বিষয়টি অতীব গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেন (হোসেন, ২০১৪, পৃ. ৫১৭)। এতৎসত্ত্বেও হবু রাষ্ট্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে তা নিয়ে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ এবং তাদের অনুসারী বুদ্ধিজীবীগণ ভাবতে শুরু করেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর একপ্রকার আগ্রাসি মনোভাব থেকেই মুসলিম লীগ সরকার দেশটির মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬.৪০% লোকের মাতৃভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে ৩.৩% লোকের ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করে (কবির, ২০১৪, পৃ. ২)। এর প্রতিবাদে আবদুল হক, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ এনামুল হক, আবুল কাসেম, আবুল মনসুর আহমদ, কাজী মোতাহার হোসেন, ফররুখ আহমদ, মাহবুব জামাল জাহেদী প্রমুখ লেখনী ধারণ করেন এবং বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। এ সময় বুদ্ধিজীবী ও সচেতন-মহল উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদ করলেও সাধারণ মানুষ এ বিষয়ে সচেতন ছিল না বললেই চলে। শুধু তাই নয়, অনেকে প্রকাশ্যে উর্দুর সমর্থক ছিলেন।[৭]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক, প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও সচেতন ছাত্ররা লেখনী সঞ্চালন ও সেমিনারে বক্তৃতা-আলোচনার মাধ্যমে ক্রমে বাংলা ভাষার দাবিকে জোরালো করতে থাকেন। কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্র ফেডারেশন, গণ-আজাদী লীগ, তমদ্দুন মজলিস, গণতান্ত্রিক যুবলীগ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রভৃতি সংগঠন রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবির পক্ষে ছাত্রদের সংগঠিত ও জনগণকে সচেতন করতে থাকেন। ভাষা আন্দোলন রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে পাকিস্তান গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষা-বিষয়ক প্রস্তাব নাকচ হওয়ার পর (আনিসুজ্জামান, ২০১৮, পৃ. ১৭)। তিনি ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষাকেও পাকিস্তান গণপরিষদের ভাষা হিসেবে ব্যবহারের সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানসহ মুসলিম সদস্যদের বিরোধিতায় প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায়। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা রাজপথে নেমে আসে। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ-কর্মসূচি পালিত হয়। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট পালিত হয়। এতে ছাত্রদের সঙ্গে ঢাকা ও ঢাকার বাইরের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের নানা তথ্য পাওয়া যায়।[৮] ১১ই মার্চ ঢাকায় পিকেটিং করার সময় গ্রেপ্তার করা হয় শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক, এম এ ওয়াদুদ, কাজী গোলাম মাহবুব, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদসহ পঁচাত্তর জন

ছাত্রনেতাকে (রহমান, ২০১৭, পৃ. ২০৬)। পরে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ৮-দফা সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করে বন্দিদের মুক্তি দেন। এরপর পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ববঙ্গ সফরে এসে প্রথমে রেসকোর্স ময়দানের সংবর্ধনাসভা এবং পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন। তাঁর সামনেই ছাত্ররা প্রতিবাদ করেন (মতিন, ২০০৩, পৃ. ৪২-৪৩)। জিন্নাহর পূর্ববঙ্গ সফর এবং সরকারি দমন-পীড়নের পর প্রথম পর্বের ভাষা আন্দোলন ক্রমে থেমে যায়। এরপর সরকার আরবি হরফে বাংলা প্রচলন এবং উর্দু ভাষার প্রসারে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করলেও পূর্ববঙ্গের মানুষ তা গ্রহণ করেনি।

ভাষা আন্দোলন প্রবল রূপ ধারণ করে ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। নানাবিধ শোষণ-বঞ্চনায় পূর্ববঙ্গের মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বিদ্যমান থাকায় পরিবেশ তৈরিই ছিল। শুধু দরকার ছিল একটু উস্কানির। আর সে কাজটিই করেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন। তিনি ১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারি পল্টন ময়দানের জনসভায় উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিলে ছাত্ররা রাজপথে নেমে আসে। আন্দোলন যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে গঠন করা হয় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। এর আগে আবদুল মতিনকে আহ্বায়ক করে গঠন করা হয় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দ এবং পূর্ব পাকিস্তান যুগলীগ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, তমদ্দুন মজলিস, ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ প্রভৃতি সংগঠন ছাত্র-জনতাকে সংগঠিত করে ভাষা আন্দোলনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যান। এরপর আসে সূর্যবিস্ফোরণের দিন, ২১শে ফেব্রুয়ারি (মতিন ও রফিক, ২০০৫, পৃ. ৯৫)। প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। আন্দোলন দমনে সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা প্রশ্নে দফায় দফায় বৈঠক হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি সমস্ত পূর্ববঙ্গে ধর্মঘট পালিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলার সমাবেশে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার ঘোষণা দিয়ে দলে দলে আইন পরিষদ অভিমুখে যাত্রা করলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। ২১ ও ২২শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে শহিদ হন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউর, অহিউল্লাহ, আউয়ালসহ অনেকে। আহত ও গ্রেপ্তার করা হয় অগণিত নেতা-কর্মীকে। ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে ভাষা আন্দোলন গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। আন্দোলনের পূর্বাপর ঘটনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনে সরকারের সঙ্গে শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীদের একাংশ ও ছাত্রদের যে বাদ-প্রতিবাদ ও সংঘর্ষ হয়, তাতে সাধারণ জনগণের বিশেষ কোনো ভূমিকা ছিল না। কিন্তু বায়ান্নতে এসে দেখা যায় আন্দোলনের ভিন্ন রূপ। ২২ ও ২৩শে ফেব্রুয়ারি ও তারপরে ঢাকার বাইরে মফস্বলে অসংখ্য প্রতিবাদ-সভা ও বিক্ষোভ-মিছিল হয় (আল্‌হেলাল, ২০০৩, পৃ. ৪৬৮)। বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন:

> ১৯৪৮ সালে আন্দোলনকারী ছাত্রেরা তৎকালীন নবাবপুর রেলক্রসিং পার হলে ঢাকার স্থানীয় লোকদের দ্বারা অনেক নিগৃহীত হয়েছেন। কিন্তু ১৯৫২ সালে আমরা দেখি পুরাতন ঢাকার জনগণকে আন্দোলনে খুব সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে। শুধু তাই নয়, সে সময় সাধারণ মানুষের এই সক্রিয়তা ব্যতীত ২২শে ফেব্রুয়ারী ও তার পরবর্তী পর্যায়ে আন্দোলন যেভাবে বিস্তার লাভ করেছিলো এবং যেভাবে বিকশিত হয়েছিল সেটা কিছুতেই সম্ভব হতো না। এ ছাড়া ঢাকার বাইরে ব্যাপক গ্রামাঞ্চলে আন্দোলনের বিস্তার যেভাবে ঘটেছিলো তার থেকেই প্রমাণিত হয় যে, ১৯৫২ সালে জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন মৌলিক সমস্যাগুলির সঙ্গে এই আন্দোলনের একটা গভীর ঐক্যসূত্র ইতিপূর্বেই স্থাপিত হয়েছিলো। এবং এই ঐক্যের সূত্র ধরেই

> ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পরিগ্রহ করেছিলো এক অদৃষ্টপূর্ব ব্যাপকতা (উমর, ২০১৭ : ৩, পৃ. ৩৮৪-৩৮৫)।

কাজেই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, মুসলিম লীগ সরকারের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শোষণ-বঞ্চনায় পূর্ববঙ্গের মানুষের মধ্যে ধীরে ধীরে যে ক্ষোভের সঞ্চার ঘটেছিল, তা-ই তাদের ব্যাপকভাবে ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত করেছিল।

ভাষা আন্দোলনে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তথা শ্রমিকদের ভূমিকা

পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলনে অগণিত সাধারণ মানুষ তথা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের তথ্য পাওয়া যায় ঐ সময়কার পত্র-পত্রিকা, ভাষাসংগ্রামীদের সাক্ষাৎকারসহ বিভিন্ন দলিলপত্রে। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে সরকার ডাকটিকেট, খাম, স্ট্যাম্প প্রভৃতি থেকে বাংলা ভাষাকে বাদ দিলে প্রথম যাদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ ওঠে, তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় পলাশী ব্যারাকে বসবাসরত সরকারি কর্মচারীদের কথা। বাংলা ভাষার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করায় পুরনো ঢাকার উর্দুভাষী উচ্ছৃঙ্খল একদল লোক গাড়িতে এসে তাদের ওপর হামলা চালায়। এতে ব্যারাকের একজন দারোয়ানের নাক ভেঙে যায়। হামলার প্রতিবাদে পলাশী ব্যারাকের কর্মচারীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মিছিল নিয়ে সচিবালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ভাষার দাবিতে ঢাকার বুকে সাধারণ মানুষের মিছিলে অংশগ্রহণ এটাই প্রথম (উমর, ২০১৭ : ১, পৃ. ৩৪)। ১৯৪৮ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি বগুড়ায় ভাষা আন্দোলনের মিছিলে মুসলিম লীগ কর্মীরা হামলা চালালে তার প্রতিবাদে ৩রা মার্চ স্থানীয় আলতাফুন্নেসা মাঠে দশ-বারো হাজার লোকের সমাবেশ হয়।[৯] পাকিস্তান গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব নাকচ হওয়ার প্রতিবাদে ১৯৪৮ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারি পাবনায় হরতাল পালিত হয়। সকাল থেকেই এডওয়ার্ড কলেজের ছাত্ররা মিছিল নিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করলে তাদের সঙ্গে যোগ দেন হোসিয়ারি শিল্পের শ্রমিক, বিড়ি শিল্পের শ্রমিক, দোকানের কর্মচারী ও সাধারণ মানুষ (আলীম, ২০২১, পৃ. ৬৭২)। ১১ই মার্চ ধর্মঘটের দিন যশোর এম এম কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল বের করলে তাদের সঙ্গে যোগ দেন অনেক পথচারী, দোকানদার ও রিকশাচালক (রহমান, ১৯৮৬)। নারায়ণগঞ্জের লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিলসহ বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকরা ছাত্রদের সঙ্গে পিকেটিং ও মিছিলে অংশগ্রহণ করে।[১০]

১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষের এমন বিক্ষিপ্ত অংশগ্রহণ আরও বিভিন্ন জেলায় পাওয়া গেলেও তা ছিল প্রধানত ছাত্র ও প্রগতিশীল যুবকদের আন্দোলন। কিন্তু ১৯৫২ সালের ২১ ও ২২শে ফেব্রুয়ারির হত্যাকাণ্ডের পর দৃশ্যপট সম্পূর্ণ বদলে যায়। ২১শে ফেব্রুয়ারি বিকেল থেকেই ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে ঢাকাই জনতার ঢল নামে। ২২শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে গায়েবানা জানাজায় অংশগ্রহণ করেন হাজার হাজার মানুষ। ঐদিন রায় সাহেবের বাজারের নিকটস্থ মসজিদেও অনেক সাধারণ মানুষ গায়েবানা জানাজায় শরিক হন। ছাত্রদের সঙ্গে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ ছাড়াও ঢাকাসহ সমস্ত পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন মসজিদে জুম্মার নামাজের পর হাজার হাজার মুসল্লি শহিদদের

আত্মার মাগফেরাত করে মোনাজাত করে। উত্তেজিত জনতা এক পর্যায়ে সরকার-সমর্থক পত্রিকা *মর্নিং নিউজ*-এর অফিস পুড়িয়ে দেয়। বিকেলে তিন-চার হাজার মুসল্লি আজিমপুর কবরস্থানে গিয়ে শহিদদের কবর জিয়ারত করে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সেক্রেটারিয়েট ও অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল অফিসের কর্মচারীরাও এদিন গায়েবানা জানাজা ও শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। ২২শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে শহিদ হন রিকশাচালক আবদুল আউয়াল এবং অহিউল্লাহ নামের এক কিশোর। ২১ ও ২২শে ফেব্রুয়ারি সরকারি নির্মমতার প্রতিবাদে আবুল হাশিম যে বিবৃতি দেন তাতে উল্লেখ করেন, 'গত বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারের মর্মান্তিক ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিরা যে আল্লাহ ও জনসাধারণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই'।[১১] এরপর ঢাকা ও ঢাকার বাইরে পালিত লাগাতার হরতাল ও প্রতিবাদ-কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে।

ভাষা আন্দোলনে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর যে অংশগ্রহণ, তাতে শ্রমিকদের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। রিকশাশ্রমিক, বিড়িশ্রমিক, চা-শ্রমিক, হোসিয়ারি শিল্পের শ্রমিক, পাট ও বস্ত্রকলের শ্রমিক, গরু ও মহিষের গাড়ির শ্রমিক, দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কাজ করা কৃষিশ্রমিক সকলেই এ আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। ২১শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে হতাহতের প্রতিবাদে বিবৃতি দেন পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি নুরুল হুদা। বিবৃতিতে তিনি বলেন– মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বহু লোক প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, শত শত লোক আহত ও গ্রেপ্তার হয়েছে। দমননীতি উপেক্ষা করে জনসাধারণ বুলেটের গুলি বুক পেতে নিতে এবং কারাবরণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করেছে। তিনি আরও বলেন, শ্রমিকদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে করণীয় ঠিক করতে তিনি ২৮শে ফেব্রুয়ারি নিজ বাসভবনে এক সভা আহ্বানের কথাও বিবৃতিতে উল্লেখ করেন।[১২] ২২শে ফেব্রুয়ারি নায়ারণগঞ্জের হরতাল ও বিক্ষোভ-কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে শহরতলীর ঢাকেশ্বরী ১ নং, ২ নং চিত্তরঞ্জন, লক্ষ্মীনারায়ণ, আদর্শ কটন মিলস ও আদমজী জুট মিল, নারায়ণগঞ্জ কো. প্রভৃতি শিল্পকারখানার প্রায় পনেরো হাজার শ্রমিক। বিকেলে শ্রমিক নেতা ফয়েজ আহম্মদের সভাপতিত্বে নারায়ণগঞ্জে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় বিশ হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন।[১৩] চট্টগ্রামের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্য ছিলেন শ্রমিক নেতা মোসলেম উদ্দিন, নুরুজ্জামান এবং মিছির আহমেদ। এখানকার ভাষা আন্দোলনের কর্মসূচিগুলোতে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। ১লা মার্চ লালদীঘি ময়দানের বিশাল জনসভায় বক্তব্য দেন শ্রমিকনেতা জহুর আহমদ চৌধুরী। তিনি ঘোষণা করেন, যে পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা না করা হয়, পূর্ববঙ্গের শ্রমিকগণ ততদিন শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাবে। তিনি বলেন, বাংলা ভাষার সঙ্গে উর্দুর কোনো বিরোধ নেই, তাই উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষাকেও রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। আরও বলেন, পাকিস্তানের শতকরা ৫৫ ভাগ অধিবাসী বাংলা ভাষায় কথা বলে, তাদের ন্যায্য দাবিকে দাবিয়ে রাখা যাবে না। সরকার পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়েছে বিধায় তাদের পদত্যাগ করা উচিত বলে তিনি মনে করেন। সবশেষে বলেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও পুলিশের গুলিতে আমাদের ছাত্র ভাইদের অমূল্য জীবন হারাতে হলো। জনাব জহুর আহমদ গুলিবর্ষণে জড়িতদের তদন্তপূর্বক শাস্তির দাবি জানান।[১৪] পাবনার হোসিয়ারি ও বিড়িশিল্পের শ্রমিকেরা ভাষা আন্দোলনে যুক্ত হয়। দেশবিভাগের পূর্বে এসব শিল্পের কাঁচামালের সিংহভাগ আসতো কলকাতা থেকে। বিশেষ করে, বিড়িশিল্পের কাঁচামাল আসতো ভারত থেকে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এ শিল্পে বিপর্যয় নেমে আসে। তাই এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মালিক, শ্রমিক ও ব্যবসায়ীগণ

ক্ষতিগ্রস্ত হন (আলীম, ২০১৮, পৃ. ৫৭)। এক ধরনের ক্ষোভ থেকেই হোসিয়ারি ও বিড়িশিল্পের বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা এখানকার ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান তুলে ধরে। সিরাজগঞ্জের ভাষা আন্দোলনে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন এখানকার বিড়ি-শ্রমিক, রিকশাশ্রমিক, গরুর গাড়ির শ্রমিক, টমটম শ্রমিক, কুলি-কামার ও দিনমজুর শ্রেণির অনেক মানুষ (হোসেন, ২০০০, পৃ. ১৯৯)। তারা নিয়মিত সভা-সমাবেশে অংশ নিতেন, মিছিল করতেন এবং স্লোগান দিতেন (শামীম, ২০১৭, পৃ. ৫২)। সিরাজগঞ্জের রিকশাশ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নূর মোহাম্মদ বোচা ভাষা আন্দোলনে যুক্ত হতে এখানকার শ্রমিকদের সংগঠিত করেন। এখানে প্রথম শহিদ মিনার নির্মাণে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর শিশুপুত্র জিন্নাত আলীকে দিয়ে শহিদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় (আলীম, ২০১৮, পৃ. ১৩৯)।

ভাষা আন্দোলনে শ্রমিকদের অংশগ্রহণের পেছনে কাজ করেছিল তাদের ভেতরে গুমোট-বাঁধা শোষণ-বঞ্চনাজাত ক্ষোভ। তাদের সংগঠিত করে আন্দোলনে সম্পৃক্ত হতে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ছাত্রসংগঠন প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে কাজ করে। এক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রভৃতি সংগঠন ব্যাপক অবদান রাখে। বিশেষ করে, কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকদের ভাষা আন্দোলনে যুক্ত করতে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে। পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি পূর্ববঙ্গ শাখা ১৯৫২ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি সার্কুলার জারি করে ২১শে ফেব্রুয়ারির ধর্মঘট সফল করার জন্য বাঙালি-অবাঙালি রেলমজুরদের ঐক্যবদ্ধভাবে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানায়। পার্টির কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয় লিফলেট, পোস্টার এবং ছোটো ছোটো বৈঠক করে রেলমজুর ও অন্যান্য মজুর শ্রেণিকে সংগঠিত করার (উমর, ২০১৭ : ১, পৃ. ৩১০)। এ রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা পার্টির এ নির্দেশ বাস্তবায়নে নানাভাবে কাজ করে। ফলে ২১শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে হতাহতের পর রেলশ্রমিকরা হরতাল, ধর্মঘট ও মিছিল-সমাবেশে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন স্থানে রেলস্টেশন অবরোধ করা হয়। এতে ছাত্র ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে রেলশ্রমিকরাও অংশগ্রহণ করে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঘাচং রেলস্টেশন অবরোধ করে উত্তরবঙ্গগামী বাহাদুরাবাদ মেইল ট্রেনটি টানা পাঁচদিন আটকে রাখা হয়। এতে ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-সিলেট এবং চট্টগ্রাম-সিলেটের সঙ্গে পুরো উত্তরবঙ্গের রেল-চলাচল বন্ধ থাকে (ভূঁইয়া, ২০১৯)।

ভাষা আন্দোলনে কৃষকসমাজের অংশগ্রহণ

ভাষা আন্দোলনে শ্রমিকদের যে ভূমিকা, তা ছিল মূলত শহরকেন্দ্রিক। এর কারণ পাটশিল্প, বস্ত্রশিল্প, বিড়িশিল্প, হোসিয়ারি শিল্প প্রভৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত শ্রমিকরা শহরে বসবাস করতো। রিকশাশ্রমিকদের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। শ্রমিক সংগঠনগুলো শহরের শিল্প এলাকাতেই অধিক তৎপর ছিল। এবার অনুসন্ধান করা হবে গ্রামের বৃহত্তর যে জনগোষ্ঠী, সেই কৃষক এবং প্রান্তিক চাষি ও দিনমজুরেরা কীভাবে এবং কেন ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছিল? আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সংকট নানাভাবে কাজ করেছে। বাঙালিদের ওপর উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টায় সমাজের উঁচুতলার মানুষের শিক্ষাদীক্ষা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনকে যতটা করে তারচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনকে। রাষ্ট্রীয় নানা সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে এমনিতেই তারা বঞ্চিত ছিল। তাতে মরার ওপর খাঁড়ার ঘা-এর মতো মাতৃভাষার পরিবর্তে আরেকটি ভাষা চাপিয়ে

দেওয়াতে তারা নিজেদের বিপন্ন মনে করেছে। আর সে কারণেই গ্রামের সাধারণ কৃষক-কিষানিরা ব্যাপক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভাষা আন্দোলনে যুক্ত হয়েছে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর এমন স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এর আগে আর কোনো আন্দোলনে লক্ষ করা যায়নি (উমর, ২০১৭ : ৩, পৃ. ৩৯২-৩৯৩)। শ্রমিকদের মতো কৃষকদের আন্দোলনে যুক্ত করতেও কমিউনিস্ট পার্টি ভূমিকা রাখে। পার্টির পক্ষ থেকে সার্কুলার জারি করে সাধারণ জনগণকে এই বলে সচেতন করা হয় যে, মজুর ও কৃষক শ্রেণিকে অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখে শাসকগোষ্ঠী তাদের শোষণ-ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার মতলব করছে। তাই গ্রামাঞ্চলের কৃষকশ্রেণি যাতে আন্দোলনে এগিয়ে আসে সেজন্যে পার্টির পক্ষ থেকে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি এবং তার পরবর্তী দিনগুলোতে গ্রামাঞ্চলের হাট-বাজারগুলোতে হরতাল পালন, জনসভা আয়োজন প্রভৃতির মাধ্যমে কৃষকদের আন্দোলনে সম্পৃক্ত করার প্রয়াস চালানো হয় (উমর, ২০১৩ : ৩, পৃ. ৩১০)।

পাকিস্তান সরকার ডাকটিকেট, মনিঅর্ডার ফরম, স্ট্যাম্প, চাকরির পরীক্ষা প্রভৃতি থেকে বাংলা ভাষা বাদ দেওয়ায় সাধারণ মানুষ আশাহত হয়। এটা যে তাদের ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত হওয়ার পেছনে কাজ করেছিল, তা জানা যায় ১৯৪৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক উত্থাপিত তাঁর ভাষাবিষয়ক সংশোধনী প্রস্তাবের ওপর প্রদত্ত আলোচনা থেকে। তিনি বলেছিলেন, পাকিস্তানের ৬ কোটি ৯০ লাখ মানুষের মধ্যে ৪ কোটি ৮০ লাখ বাংলা ভাষায় কথা বলে। এই বাংলা ভাষাভাষী সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বাস পূর্ববঙ্গে। সেই মানুষেরা যখন মনিঅর্ডার করতে ডাকঘরে যায়, তখন তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় উর্দু এবং ইংরেজিতে লিখিত ফরম। গ্রামের গরিব কৃষক সেই ফরমের সাহায্যে তার বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া সন্তানের কাছে টাকা পাঠাতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছে। একইভাবে তারা জমি বিক্রি করতে গিয়ে যে স্ট্যাম্প ক্রয় করছে, তার ভাষাও ইংরেজি ও উর্দু। এমনকি, গণ-পরিষদের যে ভাষা তাতে লিখিত কার্যবিবরণীও তারা বুঝতে অক্ষম।[১৫] সাধারণ মানুষের এসব সমস্যার কথা তুলে ধরে তিনি ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষাকে গণপরিষদের ভাষা এবং পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেওয়ায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কতটা বিপন্ন বোধ করেছে, তা জানা যায় পূর্ববঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোর ভাষা আন্দোলনের সংগঠকদের সাক্ষাৎকার ও স্মৃতিচারণ থেকে। লালমণিরহাটের ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক জহির উদ্দিন আহম্মদ বলেছেন:

> মিছিল ও জনসভায় হাজার হাজার লোক যোগ দিত। নারী, পুরুষ, বালক, শিশু, বৃদ্ধ সবাই আসত। নারীরা আসত এজন্য যে, আমরা তাদের বুঝিয়ে ছিলাম বাংলা ভাষা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, উর্দু ছাড়া কথা বলা যাবে না। সাধারণ মানুষ তো উর্দু জানত না। তারা মাতৃভাষা হারানোর ভয়ে দলে দলে আমাদের শোভাযাত্রা ও জনসভায় যোগ দিত (আহম্মদ, ২০২১, পৃ. ১১৪১)।

বহুমাত্রিক বঞ্চনার কারণে সাধারণ মানুষদের মধ্যে এমনিতেই ক্ষোভ ছিল, ২১শে ফেব্রুয়ারির হত্যাকাণ্ড তাদের সে ক্ষোভকে দাবানলের মতো ছড়িয়ে দেয় সর্বত্র। শহিদের আত্মত্যাগ ভাষা আন্দোলনকে এমন পবিত্র মহিমায় মহিমান্বিত করে যে, দেশের আপামর জনসাধারণ শাসকের রক্ষচক্ষুকে উপেক্ষা করে আন্দোলনে যুক্ত হতে দ্বিধা করেনি। একুশে ফেব্রুয়ারির পর এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে দেশের আনাচে-কানাচে, গ্রাম-গ্রামান্তরের সুদূরতম প্রান্তে। শহীদের রক্ত যেন ডাক দিল প্রদেশের কিষাণের শক্তিকে, মধ্যবিত্তের শক্তিকে – এক কথায় দেশের প্রতিটি দেশপ্রেমিক মানুষকে (রহমান, ২০১৬, পৃ. ১১-১২)। এক কথায়, ঐ সময় ভাষা আন্দোলন ব্যাপক গণভিত্তি লাভ করেছিল এবং তা পূর্ববঙ্গের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের গণতান্ত্রিক চেতনার বিস্তার ঘটিয়েছিল (মতিন ও রফিক, ২০০৫, পৃ. ১২৭)। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা তো ছিলই;

তাদের সঙ্গে দলে দলে যোগ দিয়েছিল গ্রামের সর্বস্তরের মানুষ– কৃষক, শ্রমিক, নারী, শিশু। সমস্ত পূর্ববঙ্গই হয়ে উঠেছিল প্রতিবাদ-বিক্ষোভে উত্তাল। তখনকার পত্র-পত্রিকায় রয়েছে এর বিস্তারিত বিবরণ।[১৬] লেখক-গবেষকদের অনুসন্ধান এবং পর্যালোচনায়ও উঠে এসেছে সে-চিত্র। হাসান আজিজুল হক লিখেছেন:

> যে অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে ২১ ফেব্রুয়ারির ঢাকার সংবাদ বাংলাদেশের গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রতিবাদ, বিক্ষোভ ও আক্রোশের আগুন গোটা দেশকে তাতিয়ে তোলে– তা অকল্পনীয়। সমগ্র দেশ যেন জ্বলন্ত বারুদের কারখানায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। ... সমগ্র বাংলাদেশ ক্রোধে ক্ষোভে টগবগ করে ফুটতে থাকে। অসংখ্য শোভাযাত্রা, প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হতে থাকে – গ্রামে-গঞ্জে, শহরে শহরে, মহকুমা মহকুমা, জেলায় জেলায়। ক্রুদ্ধ মিছিলের ঢল নামে রাস্তায় (হক, ১৯৮৪, পৃ. ১৬-২০)।

ভাষার দাবি রুখতে গিয়ে পুলিশ ছাত্র-জনতার বুকে গুলি চালালে, তা পূর্ববঙ্গের মানুষকে শোকার্ত, আবেগী এবং প্রতিবাদী করে তোলে। সকল ভয় উপেক্ষা করে তারা রাজপথে নেমে আসে। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'নূরুল আমীনের কল্লা চাই', 'পুলিশি জুলুম চলবে না'– এসব স্লোগানে চারদিক মুখরিত হয়। দেয়ালে দেয়ালে প্রতিবাদী পোস্টার ছেয়ে যায়। মাইক এবং চুঙোয় দেওয়া হয় জ্বালাময়ী বক্তৃতা। সড়ক অবরোধ, মুসলিম লীগ নেতাদের বাসভবনে হামলা, রেল-চলাচল বন্ধসহ অফিস-আদালত, কল-কারখানা, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সব বন্ধ করে দেওয়া হয়। হাজার হাজার কৃষক মাঠের কাজ ফেলে যোগ দেয় মিছিল-সমাবেশে। হাট-বাজারের বেচা-কেনা পর্যন্ত বন্ধ রাখে। এমন প্রতিবাদে বাঙালি এর আগে আর কখনোই রুখে ওঠেনি। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া সর্বত্রই প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের তথ্য পাওয়া যায়। সুদূর চট্টগ্রামের রাউজানের কোয়েপাড়া ও আশাপাশের গ্রামের কৃষক-জনতা যেন একুশের ডাকের জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিল। তারা হাটে-বাজারে, পাড়ায় পাড়ায় মিছিল বের করে।[১৭] নেত্রকোণার কৃষকরা হাট বাদ দিয়ে হরতাল পালন করে। ঢাকায় ছাত্র-জনতার শহিদ হওয়ার খবর শুনে হাটে আসা অনেক কৃষক শোকে-বেদনায় কান্না শুরু করে। আঞ্চলিক ভাষায় তারা নানা ক্ষোভ প্রকাশ করে।[১৮]

কৃষকদের পাশাপাশি প্রত্যন্ত পল্লির দিনমজুরেরাও ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। তারা মিছিল-সমাবেশে যোগ দিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারির হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করে। দিন হাজিরার কাজ বাদ দিয়ে ক্ষুধাপীড়িত এই মানুষেরা হরতাল পালন করে। এমন দৃশ্য দেখা যায় খুলনার মোরেলগঞ্জ থেকে আট/দশ কিলোমিটার দূরের কাঁটাখালি গ্রামে। সেখানে দুর্ভিক্ষের পর টেস্ট রিলিফের কাজ চলছিল। তাতে প্রতিদিন পাঁচ আনা হাজিরায় কাজ করছিল পঞ্চাশজন দিনমজুর। ২২শে ফেব্রুয়ারি তারা কেউ কাজে যোগ দেয়নি। ঢাকায় ছাত্রহত্যার খবর শুনে তারা হরতাল পালন করে।[১৯] ভাষা আন্দোলন কতটা জনভিত্তি লাভ করেছিল, অভাব-অনটনে জর্জরিত দিনমজুরদের কাজ বাদ দিয়ে হরতাল পালন তার বাস্তব দৃষ্টান্ত। পূর্ববঙ্গের প্রান্তিক মানুষেরা সেদিন বুঝেছিল যে, ক্ষুণ্নিবৃত্তির চেয়ে ভাষার অধিকার তথা আত্মপরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকা অনেক মর্যাদার।

ভাষা আন্দোলনে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও যৌনপল্লির নারীদের অবদান

ভাষা আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার কারণে অনেক প্রান্তিক মানুষ গ্রেপ্তার, হয়রানি ও পুলিশি জুলুমের শিকার হয়েছিলেন। যশোরে শত শত নিরীহ মানুষকে গ্রেপ্তার ও কারাগারে আটক রাখা হয়। ময়মনসিংহের পাহাড়ি অঞ্চলের সাধারণ মানুষকে পুলিশ ব্যাপক নির্যাতন করে। ২১শে ফেব্রুয়ারির পর এখানকার শহর থেকে

গ্রাম– সর্বত্র হরতাল পালিত হয়। হালুয়াঘাট, কলসিন্দুর, দুর্গাপুর প্রভৃতি প্রত্যন্ত পল্লিতে মিছিল ও প্রতিবাদ-সমাবেশ আয়োজন করা হয়। আন্দোলন দমনে পুলিশ গ্রামে গ্রামে হানা দেয়। দুর্গাপুর-হালুয়াঘাটা থানার সীমান্তবর্তী গ্রাম নোয়াপাড়া, ভাইয়াপাড়া ও রায়পুরের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পল্লির বাড়ি বাড়ি তল্লাশী চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয় দেবেন মাস্টার, বিজয় সাংমা ও ধীরেন সাংমাকে। দেবেন সাংমার যুবতী কন্যা তারামণিকে পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে লাঞ্ছিত করা হয়।[২০] পটুয়াখালীর কালাপাড়ার রাখাইন যুবক উ সুয়ে হাওলাদার বরিশাল ব্যাপ্টিস্ট মিশন হাইস্কুলে অধ্যয়নকালে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এ কারণে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেননি (হাওলাদার, ২০২১, পৃ. ৮৬৩)।

ভাষা আন্দোলনে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে বিশেষ মাত্রা যুক্ত হয় যশোর ও বগুড়ার যৌনপল্লির নারীদের সম্পৃক্ততায়। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে যশোরে সর্বাত্মক ধর্মঘট পালনকালে পুলিশি জুলুম চরম মাত্রায় পৌঁছে। পুলিশ ছাত্রদের ঘিরে লাঠিপেটা শুরু করলে শহরের ঝালাই পট্টির যৌনপল্লির নারীরা প্রায় চল্লিশজন ছাত্রকে একটি ঘরে লুকিয়ে তালাবদ্ধ করে রাখে। এতে তারা পুলিশের নির্যাতন ও গ্রেপ্তারের হাত থেকে রেহাই পায় (হাননান, ২০০৬, পৃ. ৯৮)। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি হরতালে ছাত্র-ছাত্রী, বুদ্ধিজীবী, বিড়িশ্রমিক– এমনকি বগুড়ার সর্বস্তরের মানুষদের সঙ্গে মিছিলে শামিল হয়েছিল সেখানকার যৌনপল্লির নারীরাও। তারা চাঁদা তুলে ভাষা আন্দোলনের তহবিলে প্রদান করে।[২১] কেবল যৌনপল্লির নারীরাই নয়, ঢাকাসহ পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ নারীরাও দলে দলে ভাষা আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল।[২২] কাজেই ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্রবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে দীর্ঘকাল যেভাবে কিছুসংখ্যক ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীর আন্দোলন বলে অভিহিত করা হয়েছে, তা গ্রহণ করা যায় না; কারণ এ আন্দোলনে পূর্ববঙ্গের কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ মেহনতি জনগণের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ।[২৩]

ভাষা আন্দোলনঃ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জাগরণ ও অর্জন

মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রার পেছনে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে সাধারণ মানুষ। তাদের শ্রমে ও ঘামে গড়ে উঠেছে সভ্যতার পর সভ্যতা, নগর-বন্দর-জনপদ। কিন্তু এ মানুষগুলো সবসময় থেকেছে বঞ্চিত। সেই বঞ্চনা থেকে জমেছে ক্ষোভ, ক্ষোভ থেকে এসেছে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ। ভাষা আন্দোলনেও সে চিত্র পরিদৃষ্ট হয়। এক অর্থে, এ আন্দোলনে সবচেয়ে বেশি ত্যাগ শিকার করেছে নিম্নবর্গের মানুষ। ১৯৫২ সালের ২১ ও ২২শে ফেব্রুয়ারি যাঁরা শহিদ হয়েছিলেন; সেই সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউর, অহিউল্লাহ, আউয়ালের যে পারিবারিক পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় সকলেই ছিলেন নিম্নবর্গের মানুষ।[২৪] জেল-জুলুম-নির্যাতনের শিকার হওয়াদের মধ্যেও এ শ্রেণির মানুষের সংখ্যাই ছিল বেশি। ভাষা আন্দোলনে নিম্নবর্গের মানুষের অংশগ্রহণ স্বতঃস্ফূর্ত হলেও তাদের সংগঠিত করতে বিভিন্ন সংগঠন অবদান রেখেছে। কমিউনিস্ট পার্টি বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক ও শ্রমিকদের অধিকার-সচেতন করে তুলেছিল। তেভাগা আন্দোলন, নানকার বিদ্রোহ, হাজং বিদ্রোহ প্রভৃতির মূলে ছিল কমিউনিস্ট পার্টির নেতা-কর্মীদের সাংগঠনিক প্রয়াস। রেলশ্রমিক, রিকশাশ্রমিক, বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের প্রশ্নে তারা কাজ করেছে। এছাড়া পূর্ব-পাকিস্তান যুবলীগ, পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, তমদ্দুন মজলিস প্রভৃতি সংগঠন ছাত্র, তরুণ ও সাধারণ মানুষকে মুসলিম লীগের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জাগ্রত করে ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত হতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। জেলায় জেলায় গঠিত 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' নেতৃবৃন্দ লিফলেট বিতরণ, পাড়া-মহল্লা-হাট-বাজারে গণসংযোগ এবং সভা-সমাবেশ ও মিছিলের

আয়োজন করে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে আন্দোলনে শামিল হতে সহায়তা করে। সবকিছুর ওপরে ছিল পাকিস্তানি দুঃশাসন। এতে সকল প্রকার মৌলিক অধিকার বঞ্চিত নিম্নবর্গের মানুষ ক্ষুব্ধ ছিল। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তারা জেগে ওঠে এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রাজপথে নেমে আসে।

নিম্নবর্গ তথা সাধারণ মানুষের ভাষা আন্দোলনে এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ফল ছিল সুদূরপ্রসারী। এর ফলে তাদের মধ্যে যে জাগরণ ও ঐক্য গড়ে ওঠে, তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে। এ নির্বাচনে তারা ব্যালটের মাধ্যমে মুসলিম লীগকে জানিয়ে দেয় তাদের প্রতিবাদী রায়। শুধু তাই নয়, ভাষা আন্দোলন তাদের চেতনায় পাকিস্তানি ভাবধারার বিপরীতে বাঙালি জাতীয়তা বোধের উন্মেষ ঘটায়। সে বোধ ধাপে ধাপে স্বাধিকার সংগ্রামের জন্ম দেয় এবং তা থেকে নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠা ইস্পাত-কঠিন ঐক্য থেকে আসে সত্তরের নির্বাচনের নিরঙ্কুশ বিজয়; এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

টীকা

১. 'প্রান্তিক' শব্দের অর্থ– প্রান্তবর্তী, কেন্দ্রীয় নয়, আশপাশের, সামান্য প্রভৃতি। – আহমদ, শরীফ সম্পা. (২০১৭)। *বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*। দ্বাদশ মুদ্রণ। ঢাকা: বাংলা একাডেমি। পৃ. ৩৭১

২. 'নিম্নবর্গ' শব্দটি এসেছে ইংরেজি 'Subaltern' থেকে। সাবঅল্টার্ন সামরিক শব্দ। অধস্তন মর্যাদার সৈন্য বা মর্যাদায় অধস্তন কাউকে বোঝাতে শব্দটি ব্যবহার করা হয়। অন্তোনিও গ্রামসি এ শব্দটি ব্যবহার করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সেই শ্রেণির মানুষদের বুঝিয়েছিলেন, যারা শাসকশ্রেণির আধিপত্যের অংশ ছিল। কৃষক, শ্রমিক এবং ক্ষমতার বাইরে থাকা বঞ্চিত মানুষেরা এ শ্রেণির অন্তর্গত। ভারতবর্ষে উপনিবেশবাদী, সাম্রাজ্যবাদী ও জাতীয়তাবাদী ইতিহাসতত্ত্বের বিপরীতে নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার গোড়াপত্তন করেন রণজিৎ গুহ। তিনি নিম্নবর্গ বলতে সমস্ত জনসংখ্যা থেকে উচ্চবর্গের অন্তর্গতদের বাদ দিয়ে অবশিষ্টদের বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে, 'শহরের শ্রমিক ও গরিব, সর্বোচ্চপদের আমলাদের বাদ দিয়ে মধ্যবিত্তের বাকি অংশ, গ্রামের ক্ষেতমজুর গরিব চাষী ও প্রায়-গরিব মাঝারি চাষী ও নিম্নবর্গের মধ্যেও গণ্য।'–গুহ, রণজিৎ (১৯৮১)। *নিম্নবর্গের ইতিহাস*। *এক্ষণ*। কলকাতা। পৃ. ১৬

৩. 'বাঙ্গালীর বিধাতা চির-বিদ্রোহীর শোণিতের তিলক তাহার কপালে লিখিয়া দিয়াছেন।' – সেন, দীনেশচন্দ্র (২০০৬)। *বৃহৎ বঙ্গ*। প্রথম খণ্ড। তৃতীয় মুদ্রণ। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। বাংলার সাধারণ মানুষের এই বিদ্রোহের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে সুপ্রকাশ রায়ের *ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, প্রমোদ সেনগুপ্তের *নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ*, সত্যেন সেনের *বিদ্রোহী কৈবর্ত*, মুনতাসীর মামুনের *বিদ্রোহী বাঙালি*, হোসেন উদ্দীন হোসেনের *বাঙলার বিদ্রোহ* প্রভৃতি গ্রন্থে।

৪. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: সেন, সরলানন্দ (১৯৭১)। 'কেন্দ্রীয় বাজেটে পূর্ববঙ্গ'। *ঢাকার চিঠি*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: মুক্তধারা। পৃ. ৬১-৬২

৫. 'সম্প্রতি সমগ্র জগন্নাথপুর থানা এবং সুনামগঞ্জ ও ছাতক থানার কয়েকটি সার্কেলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। এই বৎসর আমন ফসল সমূলে বিনষ্ট হওয়ায় এই ভয়াবহ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। প্রায় এক লক্ষ

লোক অন্নাভাবে করাল মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে কলেরা ও গো মোড়ক দেখা দিয়েছে। লোকের দুরবস্থার কথা ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।' – *সাপ্তাহিক নও-বেলাল*, ১১ই মার্চ ১৯৪৮

৬. *দৈনিক আজাদ*, ২৩শে এপ্রিল ১৯৩৭।

৭. 'সকলেই জানেন দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার মত লোক খুব কমই ছিল। শুধু তাহাই নয়, তখন অনেকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে উর্দুরই সমর্থক ছিল।'– কাশেম, আবুল (১৯৮০)। 'স্মৃতিচারণ'। *একুশের সংকলন'৮০*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি। পৃ. ১

৮. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: হোসেন, আবু মো. দেলোয়ার সম্পাদিত (২০০০)। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি; রফিক, আহমদ (২০১৯)। *ভাষা আন্দোলন: টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া*। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন; আলীম, এম আবদুল (২০২১)। *রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন: জেলাভিত্তিক ইতিহাস*। আগামী প্রকাশনী।

৯. *দৈনিক আজাদ*, ৭ই মার্চ ১৯৪৮।

১০. *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১৫ই মার্চ ১৯৪৮।

১১. *দৈনিক আজাদ*, ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

১২. *দৈনিক আজাদ*, ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

১৩. *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

১৪. *দৈনিক আজাদ*, ২রা মার্চ ১৯৫২।

১৫. দত্ত, ধীরেন্দ্রনাথ (২০১১)। গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলা ভাষাকে অন্তর্ভুক্তকরণের প্রশ্নে বিতর্ক, পাকিস্তান গণপরিষদ, ২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২। *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র*। প্রথম খণ্ড। তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। ঢাকা। পৃ. ৫৪-৫৫

১৬. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: ১৯৫২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ই মার্চ-এর *দৈনিক আজাদ*, *আনন্দবাজার পত্রিকা*, *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক*, *সাপ্তাহিক নও-বেলাল*, *সাপ্তাহিক সৈনিক*, *সাপ্তাহিক যুগান্তর* প্রভৃতি পত্রিকা।

১৭. ''ঢাকার রাজপথে যেদিন একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনার অবতারণা হয়, সেদিন আমি ছিলাম রাউজান থানার কোয়েপাড়া গ্রামে।... রেডিওতে রাষ্ট্রভাষা সমাবেশের ওপর মুসলিম লীগ সরকারের গুলিবর্ষণে ছাত্র হত্যার খবর পাই। এ অবস্থায় স্থানীয় পার্টি কমিটির সাথে আলোচনা করে আমরা রাষ্ট্রভাষার সমর্থন ও ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে হাট-বাজারে হরতাল, রাতে পাড়ায় পাড়ায় মিছিল, স্কুল ও কলেজে ধর্মঘট ইত্যাদি সংগঠিত করি।... এতদিন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল রাজধানী, জেলা শহর ও বন্দরে। এবার সে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল গ্রামাঞ্চলে। জনগণের সাড়া মিলল অভাবনীয়। মনে হলো যেন একুশের ডাকের জন্য কৃষক-জনতা প্রস্তুত হয়ে ছিল অনেক আগে থেকে।'' – দস্তিদার, শরদিন্দু (২০১৯)। *জীবনস্মৃতি*। অখণ্ড পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ। ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ। পৃ. ১২৪-১২৫

১৮. ''আমরা আমরার পুলাপানরে শহরে পাঠাই লেখাপড়া শিখনের লাই আর সেখানে গিয়া গুলি খাইয়া মরব এই অবস্থা যদি চলে তাইলে শুনতেছি তারা নাকি ভোট চাইতে আসব। ভোট নাকি অব, তাই ভোট চাইতে গেলে ভোটের বদলে ঝাড়া মারা লাগবো। আজকে আপনারা হাটে-বাজারে যাবেন না। আইজের জন্য আমরা হরতাল করলাম।'' – সরকার, যতীন (২০১৫)। 'ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে উপেক্ষিত মফস্বল'। *দৈনিক যুগান্তর*। ঢাকা। ৫ই ফেব্রুয়ারি।

১৯. প্রান্তিক মানুষদের এমন প্রতিবাদের খবর পাওয়া যায় ঐ সময় খুলনার মোরেলগঞ্জে নিয়োজিত টেস্ট রিলিফ অফিসার কিউ. কিউ. এম. জহুরের স্মৃতিচারণ থেকে। তিনি লিখেছেন: ''আমি তখন চাকরী করি খুলনায়, মোরেলগঞ্জে। টেস্ট রিলিফের চার্জে ছিলাম, সাব ডেপুটি কালেক্টর। ২১শে ফেব্রুয়ারি রাত্রে ৮টার সময় খবর পেলাম, কলকাতা রেডিওতে। ঢাকায় গুলিতে তিন জনের মৃত্যুর খবর বললো। পরের দিন। মোরেলগঞ্জ একটা থানা হেড কোয়ার্টার। সেখান থেকে ৮/১০ মাইল দূরে কাঁটাখালিতে, একেবারে গণ্ডগ্রাম, রিলিফের কাজ হচ্ছিলো। সেখানে কাজ করতে গেলাম। দৈনিক ৫ আনা মজুরীতে কাজ হতো। ৫০ জনের মতো। দুর্ভিক্ষের পর সাহায্যের জন্য কাজ। সেদিন কেউ নেই কাজে। খুঁজে কয়েকজনকে বের করলাম। জিজ্ঞেস করায় তারা বললো, হরতাল করছি। ঢাকায় ছাত্রদের উপর গুলি চলা ও ছাত্র মারা যাওয়ার ফলে।'' – উদ্ধৃত, উমর, বদরুদ্দীন (১৯৯৫)। *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ: কতিপয় দলিল*। দ্বিতীয় খণ্ড। ঢাকা: বাংলা একাডেমি। পৃ. ৩৬৫।

২০. *সাপ্তাহিক মতামত*। ১৯৫২, ৫ই এপ্রিল।

২১. ''... তৎকালীন মুসলিম লীগ বগুড়ায় একুশে ফেব্রুয়ারির হরতাল না মেনে নিলেও বগুড়ার ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, বিড়ি শ্রমিক, পতিতারা রাস্তায় নেমে আসে এবং একুশে ফেব্রুয়ারি বগুড়ায় কোনো দোকান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত না খোলায় হরতাল পালন হয়। এই হরতালে বগুড়ার আশপাশের কৃষকরা হাল নিয়ে মাঠে যায়নি। আন্দোলনকারীদের অনেকেই ঘর ছেড়ে আত্মগোপন করেন। ... স্থানীয় পতিতারা চাঁদা তুলে সহযোগিতা করেছেন এবং আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন। বিড়ি শ্রমিকদের একটা অংশ যোগ দেওয়ার পরে সর্বস্তরের শ্রমিকরা রাস্তায় নেমে পড়লে বগুড়ায় আন্দোলন ফুঁসে ওঠে।'' – কবীর, আমানুল্লাহ ও ইসলাম, ফাইজুল সম্পা. (২০১১)। *জেলায় জেলায় ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। সপ্তম প্রকাশ। ঢাকা: মিজান পাবলিশার্স। পৃ. ১০৬

২২. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: কবির, মোহাম্মদ হুমায়ুন (২০১৪)। *ভাষা-আন্দোলন ও নারী*। বাংলা একাডেমি। ঢাকা; রফিক, আহমদ (২০১৯)। *ভাষা আন্দোলন: টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া*। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

২৩. উমর, বদরুদ্দীন (২০১৯)। *বাঙলাদেশে ইতিহাস চর্চা*। তৃতীয় মুদ্রণ। ঢাকা: কথাপ্রকাশ। পৃ. ১০৪

২৪. বিভিন্ন সূত্রে ভাষা আন্দোলরনর শহীদদের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় – শহীদ রফিকউদ্দিন আহমদের পিতা আবদুল লতিফ ছিলেন ঢাকার বাতামতলীর প্রিন্টিং প্রেসের মালিক। তার আর্থিক অবস্থা খুব ভালো ছিল না। রফিক ঢাকার জগন্নাথ কলেজে ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণিতে পড়ালেখার পাশাপাশি পিতার ব্যবসায়ে সহযোগিতা করতেন। শহীদ শফিউর রহমান ছিলেন ঢাকা হাইকোর্টের হিসাবরক্ষণ শাখার কেরানি, পাশাপাশি বি. এ. শ্রেণিতে পড়তেন। আবদুস সালাম অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান সরকারের ডিরেক্টরেট অব ইন্ডাস্ট্রিজ বিভাগে পিয়ন পদে চাকুরি করতেন। আবদুল জব্বার

পরিবারের দারিদ্র্যের কারণে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করে আর পড়তে পারেনি। প্রথম দিকে পিতাকে কৃষিকাজে সহযোগিতা করলেও পরে বার্মা গিয়ে জাহাজঘাটে চাকুরি নেন। এরপর গ্রামে ফিরে এসে ন্যাশনাল গার্ড বাহিনীতে যোগ দেন এবং ছোট-খাটো ব্যবসায় করে জীবিকানির্বাহ করেন। ভাষাশহীদ আওয়াল ছিলেন রিকশাচালক। কিশোর অহিউল্লাহর পিতা ছিলেন রাজমিস্ত্রী। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: খান, শামসুজ্জামান ও অন্যান্য (সম্পা.) *ভাষা আন্দোলনের শহীদেরা*। দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৫; উমর, বদরুদ্দীন (২০১৭), *পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা: সুবর্ণ সংস্করণ; আল্‌হেলাল, বশীর (২০০৩) *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

তথ্যসূত্র

আনিসুজ্জামান (২০১৮)। *স্মরণ ও বরণ*। ঢাকা: চন্দ্রাবতী একাডেমী।

আল্‌হেলাল, বশীর (২০০৩)। *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*। দ্বিতীয় মুদ্রণ। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

আলীম, এম আবদুল (২০১৮)। *সিরাজগঞ্জে ভাষা আন্দোলন*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

আলীম, এম আবদুল (২০১৮)। *পাবনায় ভাষা আন্দোলন*। পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

আলীম, এম আবদুল (২০২১)। *রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন: জেলাভিত্তিক ইতিহাস*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

আহ্‌মদ, কামরুদ্দীন (২০১৪)। *পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি*। দ্বিতীয় মুদ্রণ। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

আহম্মদ, জহির উদ্দিন (২০২১)। 'সাক্ষাৎকার: ১২ই এপ্রিল ২০২০'। *রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন: জেলাভিত্তিক ইতিহাস*। এম আবদুল আলীম [সম্পা.]। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

উমর, বদরুদ্দীন (২০১৩)। *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ: কতিপয় দলিল*। প্রথম খণ্ড। ঢাকা: প্রথম সুবর্ণ প্রকাশ।

উমর, বদরুদ্দীন (২০১৭: ১)। *পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*। ঢাকা: সুবর্ণ সংস্করণ।

উমর, বদরুদ্দীন (২০১৭: ৩)। *পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*। ঢাকা: সুবর্ণ সংস্করণ।

কবির, মোহাম্মদ হুমায়ুন (২০১৪)। *ভাষা-আন্দোলন ও নারী*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

চক্রবর্ত্তী, রতন লাল (২০১১)। 'ভাষা আন্দোলন : আঞ্চলিক ইতিহাস', *ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর*। দ্বিতীয় মুদ্রণ। আহমদ রফিক ও বিশ্বজিৎ ঘোষ [সম্পা.]। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম (২০০৮)। 'একুশের প্রশ্ন, আমনরা কে কোন পক্ষে', *একুশের নির্বাচিত প্রবন্ধ*। ড. মোহাম্মদ হারুন রশীদ [সম্পা.]। ঢাকা: সূচীপত্র।

মতিন, আবদুল (২০০৩)। *জীবনপথের বাঁকে বাঁকে*। ঢাকা: সাহিত্যিকী।

মতিন, আবদুল ও রফিক, আহমদ (২০০৫)। *ভাষা আন্দোলন: ইতিহাস ও তাৎপর্য*। তৃতীয় সংস্করণ। ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

রহমান, আতিউর সম্পা. (২০০০)। *ভাষা আন্দোলনের আর্থ-সমাজিক পটভূমি*। দ্বিতীয় খণ্ড। ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

রহমান, শামসুর (১৯৮৬)। 'যশোরে ভাষা আন্দোলন', *বিচিত্রা*। বর্ষ ১৪, সংখ্যা ৩৯। একুশে ফেব্রুয়ারি সংখ্যা, ঢাকা।

রহমান, শেখ মুজিবুর (২০১৭)। *কারাগারের রোজনামচা*। পঞ্চম মুদ্রণ। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

রহমান, হাসান হাফিজুর সম্পা. (২০১৬)। 'একুশে ফেব্রুয়ারী', *একুশে ফেব্রুয়ারী*। বিশেষ মুদ্রণ। ঢাকা: সময় প্রকাশন।

শরিফ, আহমদ সম্পা. (২০১৭)। *বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

শামীম, ইমতিয়ার (২০১৭)। *রক্তে জেগে ওঠে: মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস সিরাজগঞ্জ*। ঢাকা: সময় প্রকাশন।

সেন, সরলানন্দ (১৯৭১)। *ঢাকার চিঠি*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: মুক্তধারা।

হক, হাসান আজিজুল (১৯৮৪)। 'বায়ান্নোর একুশ: ঢাকার বাইরে'। *একুশের প্রবন্ধ ১৯৮৪*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

হাওলাদার, উ সুয়ে (২০২১)। 'সাক্ষাৎকার : ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৪', *রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন: জেলাভিত্তিক ইতিহাস*। এম আবদুল আলীম [সম্পা.]। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

হাননান, ড. মোহাম্মদ (২০০৬)। *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০ থেকে ১৯৭১*। তৃতীয় মুদ্রণ। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

হোসেন, আবু মো. দেলোয়ার সম্পা. (২০০০)। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

হোসেন, আশফাক (২০১৪)। *বাংলাদেশের ইতিহাসের রূপরেখা*। তৃতীয় প্রকাশ। ঢাকা: জে. কে. প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স।

সাক্ষাৎকার

ভূঁইয়া, নাসির উদ্দিন (২০১৯)। 'সাক্ষাৎকার: ২২শে ফেব্রুয়ারি'। *ঢাকা টাইমস*, ঢাকা।